অধ্যায় ৬ ঃ সাজাহান — ১

অধ্যায়-বিন্যাস

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৬.২ পরিচিতি

৬.৩ নাট্যকারের পরিচিতি ও ইতিহাসের কাহিনি

৬.৪ ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান'

৬.৫ 'সাজাহান' নাটকের নায়ক বিচার ও নামকরণ

৬.৬ 'সাজাহান'নাটকের সংগীত ও সংলাপ

৬.৭ অধ্যায়-সংক্ষেপ

৬.৮ অতিরিক্ত পঠন

৬.৯ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

৬.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনারা—

- ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে এবং 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান কতটা পাওয়া যায় এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের প্রকৃত নায়ক কে, এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন
- 'সাজাহান' নাটকের সংগীত বিষয়ে নিজেই বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৬.২ পরিচিতি

এই অধ্যায়টি প্রখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান' এর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবে। 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক তথ্য যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়েছে কি না, নাটকের নামকরণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না, এই সঙ্গে নাটকের সংগীতর বিষয়ে আপনাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬.৩ নাট্যকারের পরিচিতি ও ইতি হাসের কাহিনি

১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই (বাংলা ১২৭০, ৪ শ্রাবণ) সেকালের বাংলা— সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম হয়। তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান এবং মাতা প্রসন্নময়ী দেবী

ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর বংশধর কালাচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী। দ্বিজেন্দ্রলালের শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনেই নয়, তাঁর সাহিত্যিক ও শিল্পী জীবনেও মাতা পিতার নিগূঢ় প্রভাব বর্তমান। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বপুরুষদের অনেকে কৃষ্ণনগর রাজাদের দেওয়ানী কর্ম করার জন্য তাঁদের বংশ দেওয়ান চক্রবর্তীর বংশ নামে খ্যাত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কৃষ্ণনগরবাসীর কাছে অতিশয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ, সুকণ্ঠী, সংগীতজ্ঞ, সদালাপী, তেজস্বী এবং সাহিত্যরসিক। ফার্সি, বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' নামে কৃষ্ণনগর রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' ও 'গীতমঞ্জরী' গ্রন্থ দুটিও বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

পিতা কার্তিকেয়চন্দ্রের প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই কাব্যরচনা শুরু করেন। স্বরচিত গানে সুর-সংযোগও করতে শুরু করেন বাল্যকালেই। দ্বিজেন্দ্রলালের উপর অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এবং হরেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাবও অবশ্য কার্যকরী হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ছাত্রজীবন শুরু হয় কৃষ্ণনগরের 'অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলে'। এরপর কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন মেধাবী কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য আশানুরূপ পড়াশোনা করতে পারেননি। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ-এ এবং হুগলি কলেজ থেকে বি এ দুই পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৫৫৪ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলাত যান। সেখানকার 'সিসেটার' কলেজে পড়াশোনা করে তিনি ১৫৫৬ সালে F.R.A.S উপাধি পান। বিলাতে থাকাকালীন তিনি 'Lyrics of Ind' নামে একটি ইংরেজি কবিতার বই প্রকাশ করেন । বিলাত থেকে ফিরে তাঁর মতো কৃতী ছাত্রকেও ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্মে নিযুক্ত থেকে ডেপুটির চাকরি নিতে হল। চাকরি জীবনে তিনি কোনোদিনই তৃপ্তি পাননি। কর্মসূত্রে তাঁকে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি স্থানে থাকতে হয়েছিল। ১৫৫৭ সালে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

এম-এ পরীক্ষা দেবার পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম গ্রন্থ 'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ) প্রকাশিত হয়। এর দশ বছর পর 'আর্য্যগাথা' (২য় ভাগ) প্রকাশিত হয়। 'মন্দ্র' (১৯০২) কাব্য দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যসংকলন। নিজের হাসির গানগুলিকে ভিত্তি করে তিনি 'কল্কি অবতার ' বা 'সমাজবিভ্রাট ' (১৫৯৫), 'বিরহ' (১৫৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করেন। পৌরাণিক নাট্যকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'পাষাণী'(১৯০০), 'সীতা' (১৯০২), এবং 'ভীষ্ম' (১৯১৪)। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সংখ্যাও নেহাত কম নয় । একসময় তাঁর গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির জন্য। তাঁর রচনা 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৫), 'মেবার পতন' (১৯০৫), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহল-বিজয়' (১৯১৫), প্রভৃতি নাটক আজও সমান জনপ্রিয়। সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯১৩ সালের ১৭ই মে দ্বিজেন্দ্রলাল মৃত্যুবরণ করেন।

৬.৪ ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান'

'সাজাহান' ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে কতখানি সফল-- সে কথা বুঝতে হলে প্রথমেই আপনাদের জানতে হবে ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে। সাধারণ ভাবে এবং সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যে নাটকের মূল কাহিনি বা প্লট এবং প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে নির্বাচিত এবং নাট্যকারের রচনাশক্তির সহায়তায় যে নাটকের কাহিনি বা চরিত্রগুলি মানবিক গুণে সমৃদ্ধ হয়ে যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠে তাই ঐতিহাসিক নাটক।

ঐতিহাসিক নাটক— নামেই বোঝা যায়, একদিকে তা ইতিহাস এবং অন্যদিকে তা নাটক। ইতিহাসের তথ্য ঘটনা বা চরিত্রকে নাট্যকারকে গ্রহণ করতেই হবে এবং তার অতিরিক্ত জীবনের রসরূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে কবি-কল্পনার সাহায্যে। কিন্তু একাজ খুব সহজ নয়। তাই ঐতিহাসিক নাটক লেখাও কঠিন। অতীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের নিখুঁত বিবরণ দেওয়া--কোনো বিশেষ রাজা বা সম্রাটের আমলের রীতি-নীতি, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সে সবের মধ্য দিয়ে ওই সকল ব্যক্তির ঐতিহাসিক পরিচয় সত্যতার সঙ্গে চিত্রণই ঐতিহাসিকের কাজ। তথ্যের অতিরিক্ত কোনো কিছু বলার স্বাধীনতা ঐতিহাসিকের নেই। কিন্তু নাট্যকারের কাজ তো মানুষের জীবন নিয়ে। ইতিহাসের নীরস তথ্যকে তুলে ধরা নাট্যকারের একমাত্র কাজ হতে পারে না। বরং ঐতিহাসিক তথ্যের কাঠামোর ওপর কল্পনার রশ্মিপাত ঘটিয়ে তাকে জীবন্ত করে তোলা নাট্যকারের লক্ষ্য। ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা আপনাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক নাটক নাটকই, ইতিহাস নয়। তাই ঐতিহাসিক যথার্যতা যাই থাকুক না কেন, তাকে নাটক হয়ে উঠতে হবে। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজা-বাদশার কাহিনিই কি সেদিনের মানবজীবনের সমস্ত পরিচয়টুকু তুলে ধরে? ইতিহাস সাধারণত জীবনের বাইরের ঘটনাগুলির কথাই বলে, সেই ঘটনাগুলির মধ্যদিয়ে মানুষের অন্তরের পরিচয় দেয় না। সে পরিচয় দিতে পারেন নাট্যকার। ঐতিহাসিক নাটকের লেখক ইতিহাসের স্বরূপ প্রকৃতি ও তার বিপুল প্রবাহকে যেমন হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, তেমনি সেই সকল ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত নর-নারীর হৃদয়ের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের কথাও অনুভব করেন এবং নাটকে সেগুলিকে ফুটিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক তথ্য বা উপকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু তাঁর মতে ঐতিহাসিক নাটক যেহেতু নাটকই , কেবলমাত্র ইতিহাস নয়, সেজন্য 'ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্যসত্য'— এই উভয়কে সমানভাবে রক্ষা করা সম্ভব হলেই উন্নতমানের ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি করা সম্ভব।



আসুন জেনে নিই—

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামক প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, "ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসের একটি বিশেষ রস-সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতিই ঔপন্যাসিকের লোভ --- তাহার

সত্যের প্রতি তাহার কোন খাতির নাই"। রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তি ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

নাট্যকার শুধু ইতিহাসের শুকনো তথ্য তুলে ধরেন না, বরং ইতিহাস-বৃন্তে মানব-জীবনের ফুল ফোটাতে চান, সেজন্য নাট্যকার ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে আবশ্যক মতো গ্রহণ-বর্জন করেন। এমনকি নতুন ঘটনা, আখ্যান বা দু-একটি নতুন চরিত্র সৃষ্টির স্বাধীনতাও তাঁর আছে। ঐতিহাসিক নাটক-রচয়িতা তাঁর রচনায় প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি অবশ্যই ইতিহাসের পাতা থেকে নেবেন, কিন্তু এমন ভাবে চরিত্রগুলিকে তিনি নাটকে ফুটিয়ে তুলবেন যাতে তা ইতিহাসের অবিকল নকল হবে না। মোটকথা ইতিহাসের পরিচয় মোটামুটিভাবে রক্ষা করে সেই চরিত্রে ইতিহাসে নাবলা বা সামান্য বলা মানবিক পরিচয়কে মুখ্য করে ইতিহাস ও মানবজীবনের সমন্বয় সাধন করতে হবে নাট্যকারকে। এ-ছাড়া, যে-কাল বা যুগের ইতিহাসকে আশ্রয় করে নাটকটি রচিত, সেই কালের রীতি-নীতি, প্রথা, আদর্শ অর্থাৎ সে যুগের সমগ্র পরিমণ্ডলটিকেও রচনা করতে হবে।

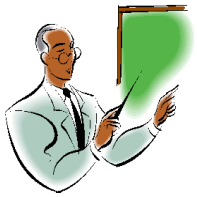
ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে এইসব সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলি মনে রেখে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটক বিচার করতে গেলে আমরা দেখব তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় কী আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'সাজাহান' নাটকের মূল কাহিনি হল মোগল সম্রাট সাজাহানের শেষ বয়সে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে চার পুত্রের মধ্যে বিরোধ এবং বিরোধের ফলে ঔরংজীবের হাতে দারা ও মোরাদের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং সুজার নির্বাসন আর এইসব ভয়াবহ ঘটনায় বৃদ্ধ, অসহায় সম্রাট সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিলাপ।

'সাজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে কতখানি অনুসরণ করেছেন, তা এই নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। যে কালের ইতিহাস নিয়ে নাটকটি লিখিত তা মোটামুটি এইরূপ ঃ ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালের ত্রিশ বছর পূর্ণ হল । ১৬৫৭ থেকে ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত সাজাহানের রাজত্বকালের ঘটনাই এই নাটকের বিষয়। এই বছরেই (২৪ জানুয়ারি, ১৬৫৭) সম্রাটের সাতষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হয় এবং ওই বছরেই সাজাহান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় রাজ্যে গুজব রটে যায় যে সম্রাট সাজাহানের মৃত্যু হয়েছে । সাজাহানকে তখন শয়ন কক্ষের জানালা থেকে দাঁড়িয়ে প্রজাদের দর্শন দিয়ে প্রমাণ করতে হল যে তিনি জীবিত। এদিকে অসুখ ক্রমশ বাড়তেই থাকল। মৃত্যু আসন্ন জেনে সাজাহান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে রাজধানী দিল্লি ছেড়ে আগ্রায় বাস করতে শুরু করলেন। কারণ আগ্রায় তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের সমাধি আছে। সাজাহানের চার পুত্রের মধ্যে দারা পিতার খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। পিতার অসুস্থতার সময় তিনি আগ্রায় পিতার কাছেই থাকতেন। সাজাহানের অন্য পুত্রেরা অর্থাৎ ঔরংজীব, সুজা ও মোরাদ কেউই দারার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। সম্রাট সাজাহান আসলে জীবিত নেই এবং সিংহাসনের

লোভে দারা এ-সংবাদ গোপন করছেন— এরূপ অনুমানে তিনপুত্র বিদ্রোহ করলেন। এর জন্য দারার দায়িত্বও কম ছিল না। সুজা, ঔরংজীব ও মোরাদ ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশে, দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে। রাজধানীর কোনো চিঠিপত্র যাতে তাঁদের হাতে না পড়ে, দারা সুকৌশলে সে ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে সংশয় বেড়ে গেল। সাজাহানের মৃত্যু সংক্রান্ত গুজবটি অতিরঞ্জিত হয়ে সুজা, ঔরংজীব, মোরাদের কাছে পৌঁছাতে লাগল। সাজাহানের এক কন্যা রৌশনারা এতে ইন্ধন জোগালেন। কারণ রৌশনারা ছিলেন ঔরংজীবের পক্ষে এবং দারাকে তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। এসবের ফলে সিংহাসনলোভী তিনপুত্র সৈন্যদল নিয়ে আগ্রার দিকে যাত্রা করলেন। তারপরেই শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম। এই ঘটনাবৃত্তই 'সাজাহান' নাটকের মূল কাঠামো রচনা করেছে।

'সাজাহান' নাটকের ঘটনাকাল প্রায় আট বছরের। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর— ডিসেম্বর মাস থেকে সাজাহান নাটকের ঘটনা শুরু হয়েছে, নাটক শেষ হয়েছে সাজাহানের মৃত্যুর কিছুকাল আগে (১৬৬৬)। 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রায় অবিকৃত ভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের প্রথমেই সাজাহান, দারা ও জাহানারার কথোপকথনের মধ্যে সেই সময়ের রাজনৈতিক সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে। সম্রাট সাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদের দমনের ভার দিলেন দারার উপর। সুজাকে দমন করার জন্য পাঠানো হল জয়সিংহ ও দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সোলেমানকে। ঔরংজীবের বিরুদ্ধে পাঠানো হল রাজা যশোবন্ত সিংহকে এবং মোরাদের বিরুদ্ধে পাঠানো হল কাশিম খাঁকে । ইতিহাসের এই ঘটনাগুলি এবং তার পরিণতি নাটকে যথার্থ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। জয়সিংহ ও সোলেমানের হাতে কাশীর সুজা পরাস্ত হয়ে সপরিবারে পলায়ন করলেন (১৬৫৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি)। অন্যদিকে মোরাদ ও ঔরংজীব জয়ী হলেন (১৬৫৫ সালের ১৫ ই এপ্রিল)। দারা কিছুদিনের মধ্যে আবার ঔরংজীব ও মোরাদের সম্মিলিত শক্তিকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু ঔরংজীবরা সেই যুদ্ধেও বিজয়ী হন (১৬৫৫ সালের ২৯ মে)। সেই বছরের ৫ জুনে ঔরংজীব আগ্রায় প্রবেশ করে দুর্গ অধিকার করেন এবং পুত্র মহম্মদের প্রহরায় পিতা সাজাহানকে বন্দী করলেন। এরপর ঔরংজীব মোরাদকে বন্দী করেন এবং দুবছর কারাবাসের পর ঔরংজীবের আদেশে মোরাদকে হত্যা করা হল। অন্য ভাই সুজা ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে (১৬৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি) দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। সাজাহানের প্রিয় পুত্র দারাও সপরিবারে পালিয়ে যান এবং আজমীরের কাছাকাছি দেওরয়ে ঔরংজীবের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধেও দারা পরাজিত হন। বোলান গিরিপথ দিয়ে পালানোর সময় যে জিহন খাঁকে একদিন দারা প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন সেই জিহন খাঁ-ই পুরস্কারের লোভে দারাকে ঔরংজীবের কাছে ধরিয়ে দিলেন। সেটা ১৬৫৯ সালের ৯ই জুন । ঔরংজীবের আদেশে দারাকে হত্যা করা হল। দারার পুত্র সোলেমানও পরে ধরা পড়েন এবং বিষ প্রয়োগে তাকেও হত্যা করা হয়। সবশেষে অত্যাচারী বিজয়ী ঔরংজীব সাজাহানের কাছে ক্ষমা চান এবং সম্রাট সাজাহান ঔরংজীবকে ক্ষমা করেন।



আসুন জেনে নিই —

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এই নাটক রচনা করেন তখন মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকারের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, দু-একটি প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের উপকরণ গৃহীত হয়েছে প্রধানত ট্যাভার্নিয়ার, বোর্নিয়ার ও মানুচির কাহিনি থেকে। টডের 'রাজস্থান' কাহিনির থেকেও তিনি উপকরণ গ্রহণ করেছেন।

ইতিহাসে বর্ণিত এই সকল ঘটনাকে নাট্যকার খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। ঔরংজীবের বিজয়লাভের কথা, তাঁর হাতে পিতার বন্দীদশা, মোরাদ ও দারাকে হত্যা, সোলেমানের হত্যা— সমস্তই ঐতিহাসিক ঘটনা, কেবল শেষ দৃশ্যে সাজাহানের কাছে ঔরংজীবের ক্ষমা প্রার্থনার দৃশ্যটি ছাড়া। সাজাহানের চার পুত্রকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেভাবে তুলে ধরেছেন তাও ইতিহাস সম্মত। ইতিহাসে আছে দারাকে ঔরংজীব ***কাফের*** মনে করতেন। দুই ভাইয়ের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল। দারা ছিলেন পিতৃভক্ত। সন্তান ও পত্নীর প্রতি তাঁর অপরিসীম প্রেম ছিল। সুজা ছিলেন সংগীত প্রিয় এবং বিলাসী প্রকৃতির মানুষ। দ্বিজেন্দ্রলাল সুজাকে সে ভাবেই নাটকে এঁকেছেন। ইতিহাসে আছে ঔরংজীব ছিলেন সাহসী এবং কূটকৌশলী। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে অপদার্থ ছিলেন মোরাদ। মোরাদ ছিলেন নির্বোধ ও আরামপ্রিয়। ফলে বুদ্ধিমান ঔরংজীব সহজেই তাঁকে শিকারে পরিণত করতে পেরেছিলেন। দেখা যাচ্ছে চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। শুধু দিলদার ও পিয়ারা চরিত্র দুটি কাল্পনিক। দারা চরিত্রের প্রতি বেশি সহানুভূতি থাকার জন্য নাট্যকার তাঁর চরিত্রের ভালো দিকগুলিরই পরিচয় বেশি দিয়েছেন। জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়ার চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকারের ইতিহাস-চেতনা ও কল্পনা দুই-ই কাজ করেছে। জাহানারার চরিত্রটিও ঐতিহাসিক, তাবে ঔরংজীবকে ক্ষমার প্রসঙ্গটি ইতিহাসে নেই। নাটকে আছে প্রকাশ্য দরবারে জাহানারা ঔরংজীবকে অভিযোগ করেছেন এবং ঔরংজীবও কৌশলে সভাসদদের নিজের পক্ষে টেনে এনেছেন— এই দৃশ্যটির মধ্যে নাটকীয় চমৎকারিত্ব থাকলেও ঐতিহাসিক নয়।



কাফের ঃ মুসলমানেরকাছে ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী, বিধর্মী এবং নাস্তিক মানুষ।

এতক্ষণের আলোচনায় আপনারা জানলেন যে 'সাজাহান' নাটক ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ। ইতিহাসের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই ইতিহাসের নাবলা কথা বা সামান্য বলা মানবিক পরিচয়কে নাটকে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসে যেমন সাজাহানের সম্রাট সত্তার কথা বিশদ ভাবে আলোচিত, দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু নাটকের প্রয়োজনে সাজাহানের পিতৃসত্তাকে বড় করে দেখিয়েছেন কারণ সিংহাসন নিয়ে পুত্রদের মধ্যে বিবাদ এবং সেই সূত্রে পিতা সাজাহানের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে ফুটিয়ে তোলাই ছিল নাট্যকারের লক্ষ্য। দারা, ঔরংজীব, সুজা, মোরাদ, সোলেমান, জাহানারা প্রভৃতি প্রায় সব চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার মানবজীবনের চিরন্তন সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র হয়েও যেজন্য এরা সব দ্বিজেন্দ্রলালেরই সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব এখানেই

যে তিনি একই সঙ্গে ইতিহাসের দাবি এবং নাটকের দাবি মেটাতে পেরেছেন। নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের কিছু কিছু নতুন সংযোজন এবং কিছু অদলবদল হওয়ার কথা মনে রেখেই বলা যায় 'সাজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক ঐতিহাসিক নাটক।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ বন্দী সাজাহানের প্রহরায় কে ছিলেন?

ক. জয়সিংহ খ. সোলেমান

গ. মহম্মদ ঘ. কাশিম খাঁ

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ দারাকে ঔরংজীবের কাছে কে ধরিয়ে দিয়েছিল?

ক. যশোবন্ত সিংহ খ. রৌশনারা

গ. দিলদার ঘ. জিহন খাঁ

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ পিয়ারা কাল্পনিক চরিত্র — সত্য/মিথ্যা

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ সোলেমানকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল — সত্য/মিথ্যা

.....

৬.৫ 'সাজাহান' নাটকের নায়ক বিচার ও নামকরণ

'সাজাহান' নাটকটির নায়ক কে এবং এর নামকরণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না— এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। প্রখ্যাত সমালোচক সুকুমার সেন মনে করেছেন এই নাটকে ট্র্যাজেডি সাজাহানের জীবনে ঘটেনি, সুতরাং এই নাটকের নায়ক সাজাহান নয়। তাঁর মতে নাটকটির নাম 'সাজাহান' না হয়ে 'জাহানারা' হলেই ভালো হত। আরেক সমালোচক অজিত কুমার ঘোষ মনে করেন নাটকটির নায়ক ঔরংজীব। আবার সমালোচক ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং রথীন্দ্রনাথ রায় স্পষ্ট মত দিয়েছেন যে এই নাটকের নায়ক সাজাহানই। আমরাও তা ই মনে করি।

আপনারা একথা মনে রাখবেন যে, নাটকের কাহিনির কেন্দ্রস্থলে যে চরিত্র থাকে, যাকে ঘিরে নাটকের সমস্ত ঘটনা পরিচালিত হয় এবং যার প্রয়োজনেই অন্যান্য চরিত্র নাটকে আসে – সেই চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্র, সেই চরিত্রটিই নাটকের নায়ক। তার নামেই বা নাটকের মূল প্রতিপাদ্য ভাবটিকে আশ্রয় করে নাটকের নামকরণ করা হয়। 'সাজাহান' নাটকটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারব যে, দারার জীবনকাহিনি অতিশয় করুণ ও মর্মস্পর্শী হলেও দারার মৃত্যু কাহিনিকে উপস্থাপিত করার জন্য এ-নাটক লেখা হয়নি। এই নাটকে সম্রাট পক্ষের দারা যেমন আছে, তেমনি মোরাদ ও সুজাও আছে তাদের নিজস্ব কাহিনি নিয়ে। কিন্তু

নাট্যকারের মূল পরিকল্পনা তাঁরা নন। এমনকি দারাও সম্রাট সাজাহানের নির্দেশে বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত। দারার মৃত্যু সাজাহানের দুঃখকে বাড়িয়েছে, কিন্তু দারা এই নাটকের প্রধান চরিত্র নয়।

জাহানারা নাটকের একটি উজ্জ্বল চরিত্র। পুত্রস্নেহে দুর্বল পিতা সাজাহানকে জাহানারা বারবার বিদ্রোহীপুত্রকে দমন করতে উদ্দীপ্ত করেছেন। জাহানারা তেজস্বিনী নারী। ধূর্ত ঔরংজীবকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করতে জাহানারা ভয় পাননি। অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে পিতাকে রক্ষা করতে মাঝে মাঝেই তিনি বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর কথায় সাজাহান দারাকে বিদ্রোহ-দমনে অনুমতি দেন। তারপর দারা যুদ্ধ করেন এবং তার পরিণতিতেই দারার মৃত্যু হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাজাহান ও দারার ভাগ্যবিপর্যয়ের মূলে জাহানারার পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। তবু আমরা বলব যে, জাহানারা এ-নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, কারণ তাঁকে ঘিরে নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়নি। কিছুতেই এই নাটকের নাম 'জাহানারা' হতে পারে না।

নাটকে ঔরংজীবের চরিত্রই সবচেয়ে সক্রিয়। নাটকের অধিকাংশ স্থান জুড়েই তিনি আছেন। তাঁর চরিত্রে একদিকে আছে লোভ, নিষ্ঠুরতা, ছলনা, আবার অন্যদিকে আছে বীরত্ব, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, কর্মতৎপরতা। দোর্দণ্ড প্রতাপ ঔরংজীবের চরিত্রের একটা অন্য দিকের আভাস আমরা পাই একেবারে শেষে, পিতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার দৃশ্যে। নাট্যকার ঔরংজীবের চরিত্রের কলঙ্ক যেন একটু মুছতে চাইলেন শেষের দিকে। কিন্তু ঔরংজীবের অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে কখনো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেনি। ক্ষমা চাওয়ার দৃশ্যেও কারুণ্যের সৃষ্টি হয় না। নায়ক হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঔরংজীবকে নাটকের নায়ক বলা যায় না। সাজাহানই এই নাটকের নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্বই নাটকের মূল বিষয়। তাঁরই আদেশে দারা বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হন, যার পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। দারার প্রত্যেকটি পরাজয় এবং ঔরংজীবের জয়ে হৃদয়ে আঘাত পেয়েছেন সাজাহান। দুর্বল হলেও উঠে দাঁড়িয়ে তলোয়ার হাতে নিতে চেয়েছেন। অন্যদিকে দুষ্টপুত্র ঔরংজীবের প্রতিও তিনি স্নেহশীল। সবকিছু মিলে তাঁর অন্তর্জীবনটি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বারেবারে। সাজাহানের নিষ্ক্রিয়তা নাটকের ঘটনাকে শিথিল করেনি বরং সচলই করেছে। নায়কের সক্রিয়তা শুধু শারীরিক তো নয়, তা মানসিক ও আত্মিকও। সেদিক থেকে দেখলে সাজাহান চরিত্রটি যথেষ্ট সক্রিয় । সাজাহানকে ঘিরেই নাট্য-কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এজন্য সাজাহানই এই নাটকের নায়ক। নাটকের নামকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল শেকস্‌পীয়রকে অনুসরণ করেছেন, কারণ শেকস্‌পীয়রের প্রধান ট্র্যাজেডি গুলিতে মূলত নায়কের নামানুসারেই নাটকের নামকরণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও নায়ক সাজাহানের নামেই নাটকের নাম রেখেছেন 'সাজাহান'। নামকরণটি যে যুক্তিসঙ্গত হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৫ ঃ সাজাহান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় চরিত্র। (শুদ্ধ/অশুদ্ধ)

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ 'সাজাহান' নাটকের নায়ক কি ঔরংজীব? (হাঁ/না)

.....

৬.৬ 'সাজাহান' নাটকের সংগীত ও সংলাপ

গ্রিক নাটকে কোরাস (Chorus) বা সমবেত সংগীতের বিশেষ মূল্য ছিল। সংগীত ছিল নাটকের অন্যতম উপাদান। নাটকে সংগীত ব্যবহারের একাধিক কারণ থাকতে পারে। সার্থক নাট্য সংগীত নাটকের মূল ভাবকেই প্রকাশ করে। নাটকীয় সংগীত নাটকীয় চরিত্র বিকাশের সহায়তা করে। অনেক সময় সংলাপ বা ডায়লগের মধ্যদিয়েও যা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না, সংগীতের মধ্য দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়।

আপনারা স্মরণ করুন, ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নাট্যকার ছিলেন না, তিনি কবি, সংগীতজ্ঞ, সুরকার এবং একজন সুদক্ষ গায়কও ছিলেন। সংগীত রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পৃথকভাবে তাঁর অধিকাংশ গানেরও উচ্চমূল্য আছে।



আসুন জেনে নিই —

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন সেকালের সুবিখ্যাত গায়ক। বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীত রচনা ও সেই সংগীতে সুর সংযোগ করেছেন । তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ) এর গানগুলি বারো থেকে সতেরো বছর বয়সের মধ্যে লেখা। বিলাতে থাকাকালীন তিনি বিলাতি সংগীতের চর্চাও করেছিলেন।

'সাজাহান' নাটকে মোট নয়টি গান আছে। তারমধ্যে সাতটি গান দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা, বাকি দুটি গান প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গীতি -- একটি কবি জ্ঞানদাসের আর একটি কবি চন্ডীদাসের রচিত। এরমধ্যে পাঁচটি গানই পিয়ারার। মোরাদের নর্তকী ও কাশ্মীরের নর্তকীদের গান দুটি । বাকি দুটি গান যোধপুরের চারণ-চারণীদের।

আমরা আগেই বলেছি যে পিয়ারা চরিত্রকে সম্পূর্ণ রূপে নিজের স্বাধীনতায় গড়ে তুলেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। পিয়ারার প্রত্যেক কথায় যেমন আছে পরিহাস, তেমনি কথায় কথায় তার গান। গানের মধ্য দিয়েই পিয়ারার চরিত্রটি অনেকটাই প্রকাশিত হয়েছে। পিয়ারার 'এ জীবনে মিটিল না সাধ ভালোবাসি', 'আমি সারা সকালটি বসে বসে' 'তোমার হৃদয়খানি' প্রভৃতি গানে তার ভালোবাসার এবং সুখ দুঃখ বেদনার প্রকাশ ঘটেছে।

মহামায়া চরিত্র অবলম্বন করে রাজপুত ইতিহাসের যে কাহিনি নাটকে আছে, তার প্রধান আকর্ষণ দেশপ্রেম মূলক সংগীত। তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে মহামায়ার আদেশে চারণ বালকেরা বিখ্যাত 'আমার জন্মভূমি' গানটি গেয়েছে। কবিতা ও গান হিসাবে 'আমার জন্মভূমি' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় সংগীত। কিন্তু 'সাজাহান' নাটকে সংগীতটি যেভাবে সংযোজিত

হয়েছে তাতে তার নাট্যমূল্যও কম নয়। মোটকথা, 'সাজাহান' নাটকের গানগুলিতে সুরকার, গীতকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রিবেণী সংগম ঘটেছে।

সংলাপ বা ডায়লগ (Dialogue) নাটকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ বক্তৃতাধর্মী ও অলংকারমন্ডিত। সংগীতময়তা যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার জনপ্রিয়তার কারণ, তেমনি তাঁর সংলাপের একটা ত্রুটিও বটে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংলাপের মধ্যে গঠনরীতিগত ত্রুটিও আছে, 'সাজাহান' নাটকের সংলাপেই যা স্পষ্ট হয়েছে। ইংরেজি বাগ্বিধির অতিরিক্ত অনুসরণের ফলে সংলাপের ভাষা অনেকসময় বাংলা বুলির নিজস্বতা হারিয়ে ইংরেজি-ঘেঁষা হয়ে পড়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংলাপে বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর নাটকের সকল চরিত্রই প্রায় একই ভাষায় কথা বলে। অথচ এমনটি হওয়া স্বাভাবিক নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য সংলাপ খুব জোরালো— এই ভাষা রণভূমির ভাষা, বীরের ভাষা। কিন্তু সর্বত্র এই একই ভাষা ব্যবহার করার ফলে সংলাপ মাঝে মাঝেই কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। বেশি অলংকারের ব্যবহারের জন্যও নাট্যসংলাপ কৃত্রিম হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে চরিত্রের এককভাষণ (monologue) উল্লেখযোগ্য। যখন কোনো চরিত্র সামনে বা আশে-পাশে নেই, সেই নির্জনতায় নিজের মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব হয়। অপরের সামনে যা প্রকাশ করা যায় না তা একলা থাকার অবকাশে একক উক্তিতে ফুটে উঠতে পারে। এ-অবস্থায় পার্শ্ববর্তী চরিত্র না থাকলেও এই জাতীয় উক্তি বা একাত্মভাষণ দর্শকরা ঠিক শুনতে পান। 'সাজাহান' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে কৌশলী ঔরংজীবের 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন'। ঝড় উঠবে..... ' সংলাপটি লক্ষণীয়। এ-জাতীয় সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৭ ঃ সমগ্র নাটক জুড়েই সাজাহান উপস্থিত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ 'আমার জন্মভূমি' গানটি গেয়েছেন।

(ক) পিয়ারা (খ) চারণবালক (গ) মোরাদের নর্তকী (ঘ) কাশ্মীরের নর্তকী।

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ 'সাজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা গান।

(ক) ৪ টি (খ) ৫ টি (গ) ৬ টি (ঘ) ৭ টি

.....



৬.৭ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই অধ্যায়ে আমরা 'সাজাহান' নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে এবং 'সাজাহান' নাটকে ঐতিহাসিক উপাদান কতটা রক্ষিত হয়েছে— এ বিষয়ে আপনারা বিশদভাবে জানতে পারলেন। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে নাট্যকারের কল্পনার মিশ্রণেই ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়, কেবল ইতিহাসের তথ্য তুলে ধরা নাট্যকারের কাজ নয়।
- 'সাজাহান' নাটকের নায়ক ও নামকরণ বিষয়েও আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এই নাটকের নায়ক ও নামকরণ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও আপনারা এই অধ্যায়টি পাঠ করে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, দারা, ঔরংজীব বা অন্য কেউ নয়, সাজাহানই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সাজাহানকে ঘিরেই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গত কারণেই নায়ক সাজাহানের নামে নাটকের নামকরণ করেছেন।
- এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনারা 'সাজাহান' নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব সম্বন্ধেও জানতে পারলেন। শেকস্‌পীয়রের 'কিং লিয়র' 'রিচার্ড দি থার্ড' ' অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা' প্রভৃতি নাটকের প্রভাব কোথায় কতখানি পড়েছে সে বিষয়েও আপনারা জানলেন। 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধেও আপনারা অবগত হয়েছেন।



৬.৮ অতিরিক্ত পঠন

১) ঘোষ, অজিতকুমার; *বাংলা নাটকের ইতিহাস।*
২) ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাঃ) ; *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড।*
৩) ভট্টাচার্য, আশুতোষ; *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)।*
৪) মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর; *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ জীবন ও সাহিত্য।*
৫) রায়, রথীন্দ্রনাথ; *দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার।*



৬.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ গ

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মিথ্যা

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অশুদ্ধ

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ না

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অশুদ্ধ

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খ

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ঘ

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্য



৬.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'সাজাহান'-এর সার্থকতা বিচার করুন ।

প্রশ্ন ২ ঃ 'সাজাহান' নাটকের নায়ক কে? যুক্তিসহ আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ 'সাজাহান' নাটকের গানগুলি নাট্যকাহিনিতে অপরিহার্য ছিল কি? আলোচ্য নাটকের সংগীত সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষতা বিচার করুন।

প্রশ্ন ৪ ঃ 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব বিচার করুন।

প্রশ্ন ৫ ঃ 'সাজাহান' নাটকে সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তা -- এই দু'য়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে সাজাহান চরিত্র কীভাবে গড়ে উঠেছে হয়েছে তার বর্ণনা দিন।

*** ***** ***